হিঙের কচুরি

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

আমাদের বাসা ছিল হরিবাবুর খোলার বাড়ির একটা ঘরে। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে বাড়িটাতে বাস করত। এক ঘরে একজন চুড়িওয়ালা ও তার স্ত্রী বাস করত। চুড়িওয়ালার নাম ছিল কেশব। আমি তাকে 'কেশবকাকা' বলে ডাকতাম।

সকালে যখন কলে জল আসত, তখন সবাই মিলে ঘড়া কলসি টিন বালতি নিয়ে গিয়ে হাজির হত কলতলায় এবং ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া বকুনি শুরু হত জল ভর্তির ব্যাপার নিয়ে।

বাবা বলতেন মাকে, এ বাসায় আর থাকা চলে না! ইতর লোকের মতো কাণ্ড এদের। এখান থেকে উঠে যাব শিগগির।

কিন্তু যাওয়া হত না কেন, তা আমি বলতে পারব না। এখন মনে হয় আমরা গরিব বলে, বাবার হাতে পয়সা ছিল না বলেই।

আমাদের বাসার সামনে পথের ওপারে একটা চালের আড়ত, তার পাশে একটা গুড়ের আড়ত, গুড়ের আড়তের সামনে রাস্তায় একটা কল। কলে অনেক লোক একসঙ্গে ঝগড়া চেঁচামেচি করে জল নেয়। মেয়েমানুষে মেয়েমানুষে মারামারি পর্যন্ত হতে দেখেছিলাম একদিন।

এই রকম করে কেটেছিল সে-বাসায় বছরখানেক, এক আষাঢ় থেকে আর এক আষাঢ় পর্যন্ত।

আষাঢ় মাসেই দেশের বাড়ি থেকে এসেছিলাম। দেশের বাড়িতে বাঁশবাগানের ধারে ধুতরো ফুলের ঝোপের পাশেই আমি আর কালী দুজনে মিলে একটা কুঁড়ে করেছিলাম। কালীর গায়ে জোর বেশি আমার চেয়ে, সে সকাল থেকে কত বোঝা আসশ্যাওড়ার ডাল আর পাতা যে বয়ে এনেছিল! কি চমৎকার কুঁড়ে করেছিলাম দুজনে মিলে, ঠিক যেন সত্যিকার বাড়ি একখানা। কালী তাই বলত। একটা ময়নাকাঁটা গাছের মোটা ডালে সে পাখির বাসা বেঁধে দিয়েছিল। ও বলত, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে কিংবা নষ্টচন্দ্রের রাতে রাতচরা কাঠঠোকরা কিংবা তিওড় পাখি এখানে ডিম পেড়ে যাবে।

এসব সম্ভব হয়নি আমার দেখে আসা, কারণ আষাঢ় মাসেই গ্রাম থেকে চলে এসে কলকাতার এই খোলার বাড়িতে উঠেছি।

আমার কেবল মনে হয় দেশের সেই বাঁশবনের ধারের কুঁড়েখানার কথা, কালী আর আমি কত কষ্ট করে সেখানা তৈরি করেছিলাম, ময়নাগাছের ডালে বাঁধা সেই পাখির বাসার কথা—নষ্টচন্দ্রের রাতে কাঠঠোকরা পাখি সেখানে ডিম পেড়েছিল কিনা কে জানে?

কলকাতার এ বাড়িতে জায়গা বড্ড কম, লোকের ভিড় বেশি। আমি সামনের টিনের বারান্দাতে সারা সকাল বসে বসে দেখি কলে পাড়ার লোক জল নিয়ে এসেছে, গুড়ের আড়তের সামনে গুড় নামাচ্ছে গরুর গাড়ি থেকে, বাঁ কোণের একটা দোতলা বাড়ির জানলা থেকে একটি বৌ আমার মতো তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এই গলি থেকে বার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে একটা হিন্দুস্থানী দোকানদারের ছাতুর দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে ছাতু কিনে আনি। বড় রাস্তায় অনেক গাড়ি-ঘোড়া যায়। আমাদের গ্রামে কখনো একখানা ঘোড়ার গাড়ি দেখিনি, দুচোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখেও সাধ মেটে না, কিন্তু মা যখন-তখন বড় রাস্তায় যেতে দিতেন না, পাছে
গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ি।

আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে গলির ও-মোড়ে কতকগুলো সারবন্দী খোলার বাড়ি আমাদেরই মতো। সেখানে আমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তাদের বাড়ি-ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কত কি জিনিসপত্র আছে,—আয়না, পুতুল, কাচের বাক্স, দেওয়ালে কেমন সব ছবি টাঙানো। এক এক ঘরে এক একজন মেয়েমানুষ থাকে। আমি তাদের সকলের ঘরে যাই, বিকেলের দিকে যাই, সকালেও মাঝে মাঝে যাই।

ওই বাড়িগুলোর মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুসুম। সে আমাকে খুব ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি। কুসুমের ঘরেই আমি বেশিক্ষণ সময় থাকি। কুসুম আমার সঙ্গে গল্প করে, আমাদের দেশের কথা জিজ্ঞেস করে। তাদের বাড়ি বর্ধমান বলে কোন্ জায়গা আছে সেখানে ছিল। এখন এই ঘরেই থাকে।

কুসুম বলে—তোমায় বড্ড ভালোবাসি, তুমি রোজ আসবে তো?

—আমিও ভালোবাসি। রোজ আসিই তো।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—আসসিংডি, যশোর জেলা।

—কলকাতায় আগে কখনো আসনি বুঝি?

—না।

বিকেলবেলা কুসুম চমৎকার সাজগোজ করত, কপালে টিপ পরত, মুখে ময়দার মতো গুঁড়ো মাখত, চুল বাঁধত—কি চমৎকার মানাত ওকে! কিন্তু এই সময় কুসুম আমাকে তার ঘরে থাকতে দিত না, বলত—তুমি এবার বাড়ি যাও। এবার আমার বাবু আসবে।

প্রথমবার তাকে বলেছিলাম—বাবু কে?

—সে আছে। সে তুমি বুঝবে না। এখন তুমি বাড়ি যাও।

আমার অভিমান হত, বলতাম—আসুক বাবু। আমি থাকব। কি করবে বাবু আমার?

—না না, চলে যাও। তোমার এখন থাকতে নেই। অমন করে না, লক্ষ্মীটি!

—বাবু তোমার কে হয়? ভাই?

—সে তুমি বুঝবে না। এখন যাও দিকি বাড়ি।

আমার বড় কৌতূহল হত, কুসুমের বাবুকে দেখতেই হবে। কেন ও আমাকে বাড়ি যেতে বলে?

একদিন তাকে দেখলাম। লম্বা চুল, বেশ মোটাসোটা লোকটা—হাতে একটা বড় ঠোঙায় এক ঠোঙা কি খাবার। কলকাতার দোকানে খাবার কিনতে গেলে ঐরকম পাতার ঠোঙায় খাবার দেয়। আমাদের দেশে ও পাতা নেই, সেখানে হরি ময়রার দোকানে মুড়কি কি জিলিপি কিনলে পদ্মপাতায় জড়িয়ে দেয়।

কুসুম ঠোঙা খুলে আগে আমার হাতে একখানা বড় কচুরি দিয়ে বলত—এই নাও, খেতে খেতে বাড়ি যাও।

এক কামড় দিয়ে আমার ভারি ভালো লাগল। এমন কচুরি কখনো খাইনি। আমাদের গ্রামের হরি ময়রা যে কচুরি করে, সে তেলে-ভাজা কচুরি, এমন চমৎকার খেতে নয়।

—উচ্ছ্বসিত সুরে বললাম—বাঃ! কিসের গন্ধ আবার!

কুসুম বললে—হিঙের কচুরি, হিঙের গন্ধ। ওকে বলে হিঙের কচুরি—এইবার বাড়ি যাও।

কুসুমের বাবু বললে—কে?

—কলের সামনের বাড়ির ভাড়াটেদের ছেলে। বামুন।

কুসুমের বাবু আমার দিকে ফিরে বললেন—যাও খোকা, এইবার বাড়ি যাও।

একবার ভাবলাম বলি, আমি থাকি না কেন, থাকলে দোষ কি? কিন্তু কুসুমের বাবুর দিকে চেয়ে সে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোল না। লোকটা যেন রাগী মতো, হয়তো এক ঘা মেরেও বসতে পারে। কিন্তু সেই থেকে হিঙের কচুরির লোভে আমি রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। আর রোজই কি

সকলের আগে কুসুম আমার হাতে দুখানা কচুরি তুলে দিয়ে বলবে—যাও খোকা, এইবার খেতে খেতে বাড়ি চলে যাও।

কুসুমের বাবু বলত—আহা, ভুলে গেলাম। ওর জন্যে খাস্তা গজা দুখানা আনব ভেবেছিলাম কাল। দাঁড়াও, কাল ঠিক আনব।

আমার ভয় কেটে গেল। বললাম—এনো ঠিক কাল?

কুসুমের বাবু হি-হি করে হেসে বললে—আনব আনব।

কুসুম বললে—এখন বাড়ি যাও খোকা—

—আমি এখন যাব না। থাকি না কেন?

কুসুমের বাবু আমার এই কথার উত্তরে কি একটা কথা বললে, আমি তার মানে ভালো বুঝতে পারলাম না। কুসুম ওর দিকে চেয়ে রাগের সুরে বলল—যাও, ওকি কথা ছেলেমানুষের সঙ্গে!

বাড়ি গিয়ে মাকে বললাম—মা, তুমি হিঙের কচুরি খাওনি?

—কেন?

—আমি খেয়েছি। এত বড় বড়, হিঙের গন্ধ কেমন।

—কোথায় পেলি?

—কুসুমের বাবু এনেছিল, আমায় দিয়েছিল।

—পাজি ছেলে, ওখানে যেতে বারণ করেছি না। ওখানে যাবে না।

—কেন?

—কেন কথার উত্তর নেই। ওখানে যেতে নেই। ওরা ভালো লোক না।

—না মা, কুসুম বেশ লোক। আমাকে বড্ড ভালোবাসে। হিঙের কচুরি রোজ দেয়।

—আবার বলে হিঙের কচুরি! বাড়িতে পাও না কিছু? খবরদার, ওখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

কুসুমের বাড়ি এর পরে আর দিন-দুই আদৌ গেলাম না। কিন্তু থাকতে পারিনে না গিয়ে। আবার মাকে লুকিয়ে গেলাম একদিন। কুসুম বললে—তুমি আসনি যে?

—মা বারণ করে।

—তবে তুমি এসো না, মা আবার বকবে।

—আসিনি তো দু'দিন।

—এলে যে আবার?

—তোমায় ভালোবাসি তাই এলাম।

—ওরে আমার সোনা। তুমি না এলে আমারও ভালো লাগে না। তুমি না এলে তোমার জন্যে মন কেমন করে।

—আমারও।

—কি করব, তেমন কপাল করিনি। তোমার মা তোমায় পাছে বকেন তাই ভাবছি।

—মাকে বলব না। আমার মন কেমন করে না এলে। আমি এখন যাই।

—সন্দের সময় এসো।

—ঠিক আসব।

কুসুমের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সন্ধের সময় যাই। কুসুমের বাবু এসে আমায় দেখে বললে—এই যে ছোকরা! ক-দিন দেখিনি কেন? সেদিন তোমার জন্যে খাস্তা গজা নিয়ে এলাম, তা তোমার অদৃষ্টে নেই। দাও গো ওকে দুখানা কচুরি।

—গজা এনো কাল।

—আনব গো বামুন ঠাকুর, ফলারে বামুন! কাল অমৃতি জিলিপি আনব। খেয়েছ অমৃতি?

—না।

—কাল আনব, এসো অবিশ্যি।

—কাউকে বলো না কিন্তু। মা শুনলে আসতে দেবে না।

—তোমার মা বকেন বুঝি এখানে এলে?

—হুঁ।

কুসুম তাড়াতাড়ি বললে, আরে ওর কথা বাদ দাও! ছেলেমানুষ পাগল, ওর কথার মানে আছে? তুমি বাড়ি যাও আজ খোকা। এই নাও কচুরি, খেতে খেতে যাও।

—না, এখানে খেয়ে জল খেয়ে যাই, মা টের পাবে।

—এখানে তোমাকে জল দেব না। রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে যেয়ো।

কুসুমের বাবু বললে—কেন, ওকে জল দেবে না কেন? কি হবে দিলে?

কুসুম ঝাঁজের সুরে বললে—তুমি থাম। বামুনের ছেলেকে হাতে করে জল দিতে পারবনি। এই জন্মের এই শাস্তি। খাবার দিই হাতে করে তাই যথেষ্ট।

আমার মনে মনে বড় অভিমান হল কুসুমের ওপর। কেন, আমি এতই কি খারাপ যে আমায় হাতে করে জল দেওয়া যায় না? চলে আসবার সময় কুসুম বার বার বললে—কাল সকালে কিন্তু ঠিক এসো, কেমন?

আমি কথা বললাম না।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি কুসুম বসে সজনের ডাঁটা কুটছে। আমায় বললে—এস খোকা।

—তোমার সঙ্গে আড়ি।

—ওমা সে কি কথা! কি করলাম আমি?

—তুমি যে বললে জল দেওয়া যায় না আমাকে! জল খেতে দিলে না কাল!

—এই? বস বস খোকা—সে তুমি বুঝবে না। তুমি বামুন, তোমাকে জল আমরা দিতে পারিনে। বুঝলে? কুলের আচার করছি, খাবে? এখনো হয়নি, সবে কুল গুড় দিয়ে মেখেছি—

এইভাবে কুসুমের সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল। কুলের আচার হাতে পড়তেই আমি রাগ-অভিমান সব ভুলে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। তার পর আমি উঠে মাখনের ঘরে যাই। মাখন কুসুমের পাশের ঘরে থাকে। ওর ঘরটি যে কত রকমের পুতুল দিয়ে সাজানো! একটা কাঠের তাকে মাটির আতা, আম, লিচু, কত রকমের আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস। অবিকল আতা। অবিকল আম।

মাখন বললে—এস খোকা। ও সব মাটির জিনিসে হাত দিয়ো না। বসো এখানে এসে। ভেঙে যাবে।

—আচ্ছা, তুমি তামাক খাও কেন?

মাখন হাসিমুখে বললে—শোন কথা! তামাক খায় না লোক?

—মেয়েমানুষে খায় বুঝি? কই আমার মা তো খায় না! বাবা খায়।

—শোন কথা। যে খায় সে খায়।

—কুসুমের বাবু আমায় খাস্তা গজা দেবে।

—বটে? বেশ বেশ।

—তোমার বাবু কোথায়?

মাখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

—হি হি—শোন কথা ছেলের, কি যে বলে! হি হি—ও কুসুমি, শুনে যা কি বলে তোর ছেলে—

মাখনের বয়স কুসুমের চেয়ে বেশি বলে আমার মনে হত। কুসুম সবচেয়ে দেখতে সুন্দর। মাখনকে দিদি বলে ডাকতো কুসুম।

কুসুম এসে হাত ধরে আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। কুসুম আমায় বারণ করেছিল আর কারো ঘরে যেতে। আমি প্রকৃতপক্ষে যেতাম খাবার লোভে। কিন্তু অন্য মেয়েদের ঘরের বাবু কখন আসত কি জানি। সুতরাং সে বিষয়ে আমায় হতাশ হতে চেয়েছিল। কুসুম আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে বকলে। বললে—অতশত কথায় তোমার দরকার কি শুনি? তুমি ছেলেমানুষ, কোনো ঘরে যেতে পারবে না, বসো এখানে।

—আমি প্রভার কাছে যাব—

—কেন, সেখানে কেন? যা-তা বলবে সেখানে গিয়ে আবার? বোকা ছেলে—খাওয়ার লোভ, না? এই তো দিলাম কুলচুর।

আমি আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললাম—আমি চেয়ে খাইনি। প্রভাকে জিজ্ঞেস করো।

—বেশ, দরকার নেই প্রভার কাছে গিয়ে।

—একটিবার যাব। যাব আর আসব।

সত্যি বলছি প্রভার ঘরে যাওয়ার কারণ ততটা লোভ নয়, যতটা একটা টিয়া পাখি।

টিয়া পাখিটা বলে—রাম, রাম, কে এল? দূর ব্যাটা, কাকিমা, কাকিমা। আমি ঢুকে দাঁড়ালেই বলে—কে এলে?

—আমার নাম বাসুদেব।

—কে এলে? কে এলে?

আমি হেসে উঠলাম। ভারি মজা লাগে ওর বুলি শুনতে। অবিকল মানুষের গলার মতো কথা—কে এলে? কে এলে?

প্রভা বাইরে থেকে বললে—কে ঘরের মধ্যে?

ও রান্নাঘরে রাঁধছিল। খুন্তি-হাতে ছুটে এসেছে। খুন্তিতে ডাল লেগে রয়েছে। আমি হেসে বললাম—মারবে নাকি?

—ও, পাগলা ঠাকুর! তাই বল—আমি বলি কে এল দুপুরবেলা ঘরে!

—তোমার ঘরে কুলচুর নেই? কুসুম আমায় কুলচুর দিয়েছে—খুব ভালো কুলচুর।

—কুসুমের বড়নোক বাবু আছে। আমার তো তা নেই। কোথা থেকে কুলচুর আমচুর করব?

—কুসুমের বাবু আমায় গজা দেবে।

—কেন দেবে না? মোড়ের অত বড় দোকানখানা কুসুমের পায়ে সঁপে দিয়ে বসেছে। ওখানকার কথা ছেড়ে দাও। বলে—মানিনী, তোর মানের বালাই নিয়ে মরি—

ভয়ে ভয়ে বললাম—প্রভা, রাগ কোরো না আমার ওপর।

—না না, রাগ করব কেন? দুঃখের কথা বলছি। আমিও একপুরুষ বেশ্যে। আমরা উড়ে আসিনি। পনেরো বছর বয়সে কপাল পুড়লে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।

—কেন ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?

—সে সব দুঃখের কথা তোমার সঙ্গে বলে কি হবে? তুমি কি বুঝবে? বসো, আমার ডাল পুড়ে গেল। গল্প করলে পেট ভরবে না।

—আমি যাই!

—এসো রান্নাঘরে।

প্রভার রং কালো, খুব মোটাসোটা, নাকের ওপর কালো ভোমরার মতো একটা আঁচিল। প্রভা একদিন আমাকে গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে দিয়েছিল। ওর ঘরে এত জিনিসপত্তর নেই, ওই খাঁচায় পোষা টিয়া—পাখিটা ছাড়া।

প্রভা রান্না করছে চালতের অম্বল। একটা পাথরবাটিতে চালতে ভেজানো। চালতে অনেকদিন খাইনি, দেশ থেকে এসে পর্যন্ত নয়। সেখানে আমাদের মাঠে তালপুকুরের ধারে বড় গাছে কত চালতে পেকে আছে এ সময়!

বললাম—চালতে পেলে কোথায় প্রভা?

—বাজারে, আবার কোথায়?

—বেশ চালতে।

প্রভা আর কিছু বললে না। নিজের মনে রাঁধতে লাগল।

আমি বললাম—তোমার বাবা-মা কোথায়?

—পাপমুখে সে সব কথা আর কি বলি!

—বাড়ি যাবে না?

—কোন্ বাড়ি?

—তোমাদের দেশের বাড়ি!

—যমের বাড়ি যাব একেবারে।

—তোমাদের দেশের বাড়িতে কুল আছে? আমাদের গাঁয়ে কত কুলের গাছ!

প্রভা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না। আবার নিজের মনে রাঁধতে লাগল। খানিক পরে সে একটা ঘটি উনুনের মুখে বসিয়ে চা তৈরি করে গ্লাসে আঁচল জড়িয়ে চুমুক দিয়ে চা খেতে লাগল। আমায় একবার বললেও না আমি চা খাব কিনা। অবিশ্যি আমি চা খাইনে, চায়ের সর খাই। মা আমায় চা খেতে দেয় না। চায়ের মধ্যে যে দুধের সর ভাসে, মা তাই আমাকে তুলে দেয়।

প্রভা গল্প করতে লাগল ওদের দেশের বাড়িতে কত গরু ছিল, কতখানি দুধ ওরা খেত, ওদের বাড়ির ধারে ওদের নিজেদের পুকুরে কত মাছ ছিল। আর সেসব দেখতে পাবে না ও।

হঠাৎ প্রভা একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসল। বললে—অম্বল দিয়ে দুটো ভাত খাবে?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—খাব। কুসুম টের না পায়।

প্রভা হেসে বললে—কুসুমের অত ভয় কিসের? টের পায় তো কি হবে? তুমি খাও বসে।

আমি সবে চালতের অম্বল দিয়ে ভাত মেখেছি, এমন সময় কুসুমের গলার শব্দ শোনা গেল—ও প্রভাদি, বামুনদের সেই খোকা তোর এখানে আছে? ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই, কতক্ষণ এসেছে পরের ছেলে!

আমি এঁটো হাতে দৌড়ে উঠে রান্নাঘরের কোণে লুকিয়ে রইলাম। প্রভা কিন্তু বলবার আগে কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখতে পেল। বললে—ও কি? কোণে দাঁড়িয়ে কেন? লুকনো হল বুঝি? এ ভাত মেখেছে কে অম্বল দিয়ে? অ্যাঁ—

প্রভার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে—আচ্ছা প্রভাদি, ও না হয় ছেলেমানুষ, পাগলা! তোমারও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল? কি বলে তুমি ওকে ভাত দিয়েছ খেতে?

প্রভা অপ্রতিভ হয়ে বললে—কেবল চালতে চালতে করছিল, তাই ভাবলাম অম্বল দিয়ে দুটো ভাত—

—না, ছিঃ! চলো আমার সঙ্গে খোকা। এ জন্মের এই শাস্তি আমাদের, আবার তা বাড়াব বামুনের ছেলেকে ভাত দিয়ে? চল—হাতে এঁটো নাকি? খেয়েছ বুঝি?

আমি সলজ্জ সুরে বললাম—না।

—চলো হাত ধুইয়ে দিই—

কুসুম এসে আমার হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে প্রভা বললে—আহা, মুখের ভাত ক'টা খেতে দিলিনি ওকে! সবে অম্বল দিয়ে দুটো মেখেছিল—

—না, আর খেতে হবে না। চল।

মায়ের শাসনের চেয়েও যেন কুসুমের শাসন বেশি হয়ে গেল। মুখের ভাত ফেলেই চলে আসতে হল। উঠোনের এক পাশে নিয়ে গিয়ে আমার হাত ধুইয়ে দিতে দিতে বলল—তোমার অত খাই-খাই খাই কেন খোকা? ওদের ঘরে ভাত খেতে নেই সে কথা মনে নেই তোমার? ছিঃ ছিঃ ! ওবেলা কচুরি দেব এখন খেতে। আর কক্‌খনো অমন খেয়ো না। তাও বলি, এ-ই না হয় ছেলেমানুষ—তুমি বুড়ো ধাড়ি, তুমি কি বলে বামুনের ছেলের পাতে—ছিঃ ছিঃ, লোকেরও বলিহারি যাই—

বলা বাহুল্য প্রভা এসব কথা শুনতে পায়নি, সে এদিকেও ছিল না।

বললাম—মাকে যেন বলে দিয়ো না।

—হ্যাঁ। আমি যাই তোমার মাকে বলতে! আমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

—বললে মা মারবে কিন্তু।

—মার খাওয়াই ভালো তোমার। তোমার নোলা জব্দ হয় তাহলে।

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন—কোথায় ছিলি?

—ওই মোড়ে।

—আর কোথাও যাসনি তো?

—না।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন দোষটা ছিল কুসুমেরই। সে আমাকে বললে—চলখোকা, বেড়াতে যাই। যাবে?

বিকেলবেলা। রোদ বেশি নেই। ট্রামলাইনের ওপারে যেতে দেখে আমি সভয়ে বললাম—মা বড়রাস্তা পার হতে দেয় না, বারণ করেছে।

—চলো আমি সঙ্গে আছি, ভয় নেই।

বড়রাস্তা পার হয়ে আর কিছু দূরে একটা খোলার বস্তির মধ্যে আমরা ঢুকলাম। একটা সরু গলির দুধারে ঘরগুলো। যে বাড়িতে আমরা ঢুকলাম, সেখানেও সবাই মেয়েমানুষ, পুরুষ কেউ নেই। একজন মেয়ে বললে—আয় লো কুসুমি, কতকাল পরে—বাব্বা, আমাদেরও কি আর নাগর নেই? তা বলে কি অমন করে ভুলে থাকতে হয় ভাই?

আমার দিকে চেয়ে বললে—এ খোকা আবার কে? বেশ সুন্দর দেখতে তো!

—বামুনদের ছেলে। আমাদের গলিতে থাকে। আমার বড্ড ন্যাওটা।

—বাঃ—বসো খোকা, বসো।

—ও ছেলের শুধু ভাই খাই-খাই। খেতে দ্যাও খুব খুশি।

—তাই তো, কি খেতে দিই? ঘরে কুলের আচার আছে, দেব?

আমি অমনি কিছুমাত্র না ভেবেই বলে উঠলাম—কুলের আচার বড্ড ভালোবাসি।

কুসুম মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে—তুমি কী না ভালোবাসা। খাবার জিনিস হলেই হল। না ভাই, ওর সর্দিকাশি হয়েছে। ও ওসব খাবে না—থাক।

আমার মনে ভয়ানক দুঃখ হল। কুসুম খেতে দিল না। কুলচুর। কখন হল আমার সর্দিকাশি? কুলচুর আমি কত ভালোবাসি!

খানিকটা সে-বাড়িতে বসবার পরে আমরা অন্য একটা ঘরে গেলাম। তারাও আমাকে দেখে নানা কথা জিগ্যেস করতে লাগল। বাড়ির তৈরি সুজি খেতে দিলে একখানা রেকাবি করে। তাও কুসুম আমায় খেতে দিলে না। আমার নাকি পেটের অসুখ।

সন্ধের খানিকটা আগে আমাকে নিয়ে কুসুম বড়রাস্তার ট্রামলাইন পার হয়ে এপারে এল। একখানা ট্রাম আসছিল। আমি বললাম—কুসুম দাঁড়াও—ট্রাম দেখব।

—সন্দে হয়েছে। তোমার মা বকবে।

—বকুক।

—ইস্! ছেলের যে ভারি বিদ্ধি!

—আচ্ছা কুসুম, তুমি ওকথা বললে কেন? আমায় কুলচুর খেতে দিলে না। ওরা তো দিচ্ছিল।

—তুমি ছেলেমানুষ কি বোঝো? কার মধ্যে কি খারাপ রোগ আছে ওসব পাড়ায়! তোমায় আমি যার-তার হাতে খেতে দেব! যার-তার ঘরের জিনিস মুখে করলেই হল! তোমার কি? কার মধ্যে কি রোগ আছে তুমি তা জানো?

–আচ্ছা কুসুম, 'নাগর' মানে কি?

—কিছু না। কোথায় পেলে এ কথা?

—ওই যে ওরা তোমায় বলছিল?

—বলুক। ও সব কথার তোমার দরকার কি? পাজি ছেলে কোথাকার!

কুসুম আমায় বাড়ির পথে এগিয়ে দেবার আগে বললে—চলো, কচুরি এতক্ষণ এনেছে ও। তোমায় দিই।

–দাও। আমার খিদে পেয়েছে।

—কোন্ সময়ে তোমার পেটে খিদে থাকে না বলতে পার? তোমার-মাকে যদি সামনা-সামনি পাই তো জিগ্যেস করি, ছেলের অত নোলা কেন?

—নোলা আছে তো বেশ হয়েছে? কচুরি দেবে তো?

—চল।

—গজা এনেছে?

—তা আমি জানিনে।

—গজা কাল দেবে?

—গলির রাস্তাটা কি নোংরা! বাবা রে বাবা!

—গজা দেবে তো?

হ্যাঁগো হ্যাঁ। এখন কচুরি নিয়ে তো রেহাই দাও আমায়।

সে রাত্রে কুসুম আমায় আমাদের কলটার কাছে এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। মার কাছে সত্যি কথা বললাম। কুসুমের বাড়ি গিয়েছিলাম, কুসুম কচুরি খেতে দিয়েছে। মা খুব বকলেন। কাল থেকে আমায় বেঁধে রাখবেন বললেন। বাবাকেও রাত্রে বলে দিলেন বটে, তবে বাবা সে কথায় খুব যে বেশি কান দিলেন এমন মনে হল না।

পরদিন সকালের দিকে আমার জ্বর এল। চার-পাঁচ দিন একেবারে শয্যাগত। একজন বুড়ো ডাক্তার এসে দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে গেল।

জানলার ধারেই আমাদের তক্তপোশ পাতা। একদিন বিকেলে দেখি রাস্তার ওপর কুসুম দাঁড়িয়ে আমাদের ঘরের উলটোদিকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর সঙ্গে মাখন। মাখন এগিয়ে গিয়ে আরো দুখানা বাড়ির পরে একখানা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে।

আমি ডাকলাম—ও কুসুম—

—কুসুম পেছনে ফিরে আমায় দেখতে পেল। মাখনকে ডেকে বললে—দিদি, এই বাড়ি—এই যে—

মা কলতলায়। কুসুম ও মাখন এসে জানলার ধারে দাঁড়াল।

কুসুম বললে—কি হয়েছে তোমার? যাও না কেন?

মাখন বললে—কুস্‌মি ভেবে মরছে। বলে, বামুন খোকার কি হল? আমি তাই বললাম, চল দেখে আসি।

বললাম—আমার জ্বর আজ পাঁচ দিন।

কুসুম বললে—তোমার মা কোথায়?

—কুসুম, তুমি চলে যাও। মা দেখতে পেলে আমায় আর তোমাদের ঘরে যেতে দেবে না। আমি সেরে উঠেই যাব। চলে যাও তোমরা।

ওরা চলে গেল। কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার কুসুম এসে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। নিচু সুরে বললে—যাব?

মা ঘরে নেই। বদ্যিনাথদের ঘরে ডাল মেপে নিতে গিয়েছে আমি জানি। এই গেল একটু আগে। আমায় বলে গেল—ছোট খোকার দুধটা দেখিস তো যেন বেড়ালে খায় না, আমি বদ্যিনাথদের ঘর থেকে ডাল নিয়ে আসি।

হাত দেখিয়ে বললাম—এস।

ও জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে—কেমন আছ?

—ভালো। কাল ভাত খাব।

—দুটো কমলানেবু এনেছিলাম, দেব?

—দাও তাড়াতাড়ি।

—খেয়ো।

—হ্যাঁ।

—অসুখ সারলে যেয়ো—

—যাব।

—কাল ভাত খাবে?

—বাবা বলেছে কাল ভাত খাব।

—কাল আবার আসব, কেমন তো?

—এসো। আমি না বললে জানলার কাছে এসো না।

—তাই করব। আমি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। শিস দিতে পার?

—উঁহু। আমি হাত দেখালে এসো।

পরের দুদিন কুসুম ঠিক আসল বিকেলবেলা। একদিন প্রভা দেখতে চেয়েছিল বলে ওকেও সঙ্গে করে এনেছিল। প্রভাও দুটো কমলালেবু দিয়েছিল আমায়, মিথ্যে কথা বলব না। বালিশের তলায় লেবু লুকিয়ে রেখে দিতাম ঘরে মা না থাকলে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতাম রাস্তার ওপর ছুঁড়ে।

সেরে উঠে দুদিন কুসুমের বাড়ি গিয়েছিলাম।

তার পরেই এক ব্যাপার ঘটল। তাতে আমাদের কলকাতার বাসা উঠে গেল, আমরা আবার চলে এলাম। আমাদের দেশের বাড়িতে। মা একদিন সোডাওয়াটার-এর বোতল খুলতে গিয়ে হাতে কাচ ফুটিয়ে ফেললে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। হাতের কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। বাসার সব লোক ছুটে এল বিভিন্ন ঘর থেকে। কোণের ঘরের বিপিনবাবু এসে মার হাতে কি একটা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলে। কিন্তু মায়ের হাত সারল না। ক্রমে হাতের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠল। মা আর রান্না করতে পারেন না, যন্ত্রণায় কাঁদেন রাত্রে। ডাক্তার এসে দেখতে লাগল। আমার মামারবাড়ির অবস্থা ভালো। চিঠি পেয়ে মেজমামা এসে আমাদের সকলকে নিয়ে চলে গেলেন মামারবাড়িতে।

আষাঢ় মাসের শেষ। তাল দু-একটা পাকতে শুরু হয়েছে। মামার বাড়ির গ্রামে মস্ত বড় একটা পুকুর আছে মাঠের ধারে, তার পাড়ে অনেক তালগাছ। আমি বেড়াতে গিয়ে প্রথম দিনই একটা পাকা তাল কুড়িয়ে পেলাম মনে আছে।

মার হাত সেরে গেল মামারবাড়ি এসে। ভাদ্রমাসের শেষে আমরা দেশের বাড়িতে চলে এলাম। কলকাতা আর যাওয়া হল না। বাবাও সেখানকার বাসা উঠিয়ে দেশে চলে এলেন।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরের কথা।

কলকাতায় মেসে থাকি, আপিসে কেরানীগিরি করি, দেশের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র থাকে। আমার পুরনো কলেজ-আমলের বন্ধু শ্রীপতির সঙ্গে বসে ছুটির দিনটা কি গল্প করতে করতে শ্রীপতি বললে—কাল ভাই সন্ধের পর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট দিয়ে আসতে আসতে—দুধারে মুখে রং—হরিব্‌ল।

—আমি দেখেছি। ঐ পথ দিয়েই তো আসি। আমি কিন্তু ওদের অন্য চোখে দেখি। ওদের আমি খুব চিনি। ওদের ঘরে এক সময়ে আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।

আমার বন্ধু আশ্চর্য হয়ে বললে—তোমার?

—হ্যাঁ ভাই, আমার। মাইরি বলছি।

যাঃ, বিশ্বাস হয় না।

—আচ্ছা, চলো আমার সঙ্গে এক জায়গায়। প্রমাণ করে দেব।

বছর পনেরো আগে একবার নন্দরাম সেনের গলি খুঁজে বার করে মাখনের বাড়ি যাই। কুসুম, প্রভা—কেউ ছিল না। ওই দলের মধ্যে মাখনই একমাত্র সে খোলার বাড়িতে ছিল তখনো।

শ্রীপতিকে নিয়ে আমি চলে গেলাম নন্দরাম সেনের গলিতে। মাখন এখনো সেই বাড়িতেই আছে। একেবারে শনের নুড়ি চুল মাথায়, যক্‌খি বুড়ির মতো চেহারা। একটিও দাঁত নেই মাড়িতে।

আমি যেতে মাখন বললে—এস এস, ভালো আছ?

—চিনতে পার?

—ওমা, তোমায় আর চিনতে পারব না। আমাদের চোখের সামনে মানুষ হলে! ভালো কথা, কুসুমের খোঁজ পেইছি।

—কোথায়? কোথায়?

—শোভাবাজার স্ট্রীটে একটা মেস-বাড়িতে ঝি-গিরি করে। ঢুকেই বাঁ-হাতি। মন্দিরের পাশের ভাঙা দোতলা। আমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরে নীলের পুজো দিতে। তাই আমায় দেখালে।

শ্রীপতিকে নিয়ে সে মেস-বাড়ি খুঁজে বার করলাম। সন্ধে তখনো হয়নি, নীচে রান্নাঘরে ঠাকুরকে বললাম তোমাদের ঝি কোথায় গেল?

—বাজারে গিয়েছে বাবু। এখুনি আসবে। কেন?

—দরকার আছে। তার নাম কুসুম তো?

—হ্যাঁ বাবু।

একটু পরে একজন লম্বা রোগা ঝি-শ্রেণীর মেয়েমানুষ সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাকুর বললে—ও কুসুম, এই বাবুরা তোমায় খুঁজছেন!

আমি ঝি-এর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বাল্যদিনের সেই সুন্দরী কুসুম এই! মাখনের মতো অত বুড়ি না হলেও—কুসুমও বুড়ি। বুড়ি ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যাবে না। ওর মুখ আমার মনে ছিল, সে মুখের সঙ্গে এ বৃদ্ধার মুখের কিছুই মিল নেই। ঠাকুর না বলে দিলে একে সেই কুসুম বলে চেনবার কিছু উপায় ছিল না।

কুসুমও আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—আমায় খুঁজছেন আপনারা? কোত্থেকে আসছেন?

—মাখনের কাছ থেকে।

—কোন্ মাখন?

—নন্দরাম সেনের গলির মাখন বাড়িউলি।

—ও! তা আমায় খুঁজছেন কেন?

—চলো ওদিকে। কথা আছে।

—চলুন খাবারঘরে বসবেন।

খাবারঘরে গিয়ে বললাম—কুসুম, আমায় চিনতে পারো?

—না বাবু।

—নন্দরাম সেনের গলিতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন আট বছরের ছেলে। আমার বাবা-মা ছিলেন ঈশ্বর নাপিতদের বাড়ির ভাড়াটে। মনে হয়?

কুসুম হেসে বললে—মনে হয় বাবু। তুমি সেই পাগলা ঠাকুর? কত বড় হয়ে গিয়েছ! বাবা-মা আছেন?

—কেউ নেই!

—ছেলেপুলে ক'টি?

—চার-পাঁচটি।

—বসো বসো বাবা।

আরো অনেক কথাবার্তার পরে কুসুম আমাদের বসিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেল। খানিক পরে চট করে কোথা থেকে একটা শালপাতার ঠোঙায় খাবার এনে দুখানা থালাতে আমাদের দুজনকে খেতে দিলে।

আমারও মনে ছিল না। খেতে গিয়ে মনে হল। বড় বড় হিঙের কচুরি চারখানা। তখুনি মনে পড়ে গেল কুসুমের সেই বাবুর কথা, সেই হিঙের কচুরির কথা। মনে এল ত্রিশ বছর পরে আবার সেই লোভী ছেলেটির ছবি ও তার কচুরিপ্রীতি। কুসুমের নিশ্চয় মনে ছিল। কিংবা ছিল না—তা জানিনে। কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধূসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে একেবারে নন্দরাম সেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে, যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধেবেলায় ঠোঙা হাতে হিঙের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমতো।